ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন

(১৭০৭ – ১৯৪৭)

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

প্রথম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ ও আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশশাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ কোনো একক ঘটনা বা ব্যক্তির অবদানপ্রসূত ফল নয়। কারো কারো মতে[1] মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধিভিত্তিক যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় বস্তুত তা থেকেই এ উপমহাদেশে আধুনিক কালের মুসলিম সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত এই শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ (বেরেলভী) শহীদের অধিনায়কত্বে শিখ ও ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর শাহাদতের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের প্রথম পর্বের শেষ হয়। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে পূর্ব প্রান্তে বাংলাদেশ এর সংস্কার ধাক্কা লাগে। তৎকালীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশ) হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদুমিয়া (মোহাম্মদ উদ্দিন)-এর নেতৃত্বে ফারায়েজি আন্দোলন এবং পশ্চিমাঞ্চলে (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে) তিতুমীর (মীর নিসার আলী)-এর অধিনায়কত্বে যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে অংশত তাতেও অনুপ্রেরণা আসে শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অনুসৃত পথ থেকে। বাংলায় এ দুটি আন্দোলন অচিরেই দুষ্কৃতিকারী এবং স্থানীয় জমিদারবিরোধী কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ লাভ করে। হাজী শরিয়তুল্লাহ আদর্শগতভাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর অনুসারী ছিলেন না বটে, কিন্তু বাস্তবে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর নির্দেশিত পথকেই অনুসরণ করেন। দুদুমিয়া এবং তিতুমীরের প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীরা ১৮৩০-এর দশকে নতুনভাবে সক্রিয় হয়ে ১৮৫০-এর দশকে তুমুল ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেও এ আন্দোলনের জোর সহায়ক প্রভাব ছিল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) মুঘলদের কার্যকর শাসনক্ষমতার অবসান ঘটে। তাঁর দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অভিজাত আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য সংঘাত কোন্দলের ফলে এক অমঙ্গলীয়

---

১. মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও গোলাম রসুল মেহের-এর মতানুযায়ী।

মোল্লারা শরিয়াত–পরিপন্থী প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের রীতি মেনে চলে। অপরদিকে চিরাচরিত স্থানীয় রীতির প্রতি দুর্বলতাহেতু বিধবা–বিবাহ মুসলিম সমাজের স্থানে স্থানে গর্হিত, নিন্দনীয় এবং আভিজাত্যের পরিপন্থী বলে গণ্য হতে থাকে।

ক. তরিকা–ই–মুহাম্মদীয়া বা তথাকথিত ওহাবি আন্দোলন

॥১॥

তথাকথিত ওহাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজবিরোধী যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, সাধারণত তা ছিল কোনো রাজা বা জমিদারকে কেন্দ্র করে। ইংরেজের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ, ইঙ্গ–মারাঠা সংঘর্ষ এবং বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজা বা জমিদারের স্বার্থে বা নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। ওহাবি আন্দোলন কিন্তু এর ব্যতিক্রম।[৬] কোনো রাজা বা রাজপুরুষের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ–নিচ, ধনী–দরিদ্র মুসলমান এবং এসব সংগঠন পরিচালনা করেছিল ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজবংশের কয়েকজন এতে যোগ দিলেও আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো সময়েই এর শক্তি কোনো রাজা–নবাবের স্বপক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়নি।[৭]

কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের এক অংশ ক্রমশ ওহাবি অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ভারতের অন্যান্য সংগ্রামীদেরকে এই সচেতনতা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পর্যবসিত হয় বলে মনে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করে এবং ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।[৮] কারো কারো মতে, ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওহাবিদেরই।[৯]

ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওহাবি আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা আলোচনাসাপেক্ষ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য বিধায় এ আন্দোলনের নাম তরিকা–ই–মুহাম্মদীয়া আন্দোলন। আঠারো শতকে হেজাজে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সংস্কারমূলক কার্যাবলিকে ইংরেজরা

---

[৬] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃ. ১১৭

[৭] হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৮] Santimoy Roy, **Freedom Movement and Indian Muslims**, p. 20.

[৯] হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

ভারতবর্ষের মুসলমানদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং এদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী ওহাবি সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে আরবের ওহাবিদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে এদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদের ইংরেজরা ওহাবি হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী শাহ ওয়ালিউল্লাহ যখন কয়েক বছর মক্কায় বিদ্যা শিক্ষার্থে অবস্থান করছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবও সে সময় মক্কায় পড়াশুনা করছিলেন। এদের সাক্ষাৎ যোগাযোগের কোনো নজির পাওয়া যায় না, তবে মক্কার বিদ্যোৎসাহী সমাজের যে চিন্তাধারা ওহাবি নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার সঙ্গে ওয়ালিউল্লাহর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর রচনাবলিতে তার আভাস পাওয়া যায়।[১০] অধ্যাপক হবিবুল্লাহ্ বলেন, নেহায়েত সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে ওহাবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হান্টারও তাঁর গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওহাবি নাম দেন।[১১] আসলে আঠারো শতকের শেষভাবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব যে নীতিনিষ্ঠ (Puritanic) আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে।[১২] ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবি বলে পরিচয় দেননি। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর অনুগামীরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবকে তাঁদের নেতা বলে স্বীকার করেন না এবং তাঁরা নিজেদেরকে সুন্নি অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে আগ্রহী।[১৩] পীর-ফকির ও আস্তানা পূজার বিরুদ্ধাচরণ করা আরবের ওহাবিদের প্রধান নীতি, ১৮০২ সালে এই ওহাবিরা মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কবর পর্যন্ত ভাঙতে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় ওহাবি নেতারা অনেকেই পীর এবং কবর-আস্তানার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোকে ঘোর পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেন নি। অকৃত্রিম ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আরব ও ভারতের ওহাবি আন্দোলন আপোষহীন ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনেকের ধারণা, আধুনিক মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সূচনা হয় ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।[১৪]

॥২॥

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর পর এই উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এক নিদারুণ অমানিশার যুগ আরম্ভ হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হন। এই সুযোগে মারাঠারা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

---

[১০] হবিবুল্লাহ্, পৃ. ১২১, ১২২
[১১] ডাব্লিউ. হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ (বাংলা অনুবাদ, আবদুল মওদুদ), পৃ. ৫৩
[১২] হবিবুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
[১৩] মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, **Faraidi Movement in Bengal**, P. XXXVII.
[১৪] হবিবুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

ও লুটতরাজের রাজত্ব কয়েম করে।[১৫] তারা গ্রামের পর গ্রামের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে উধাও হয়ে যায়।[১৬] একবার দিল্লি এসে তারা লালকিল্লা হস্তগত করে দেওয়ানি খাসের ছাদের রৌপ্য খুলে নেয় এবং ওলিআল্লাহদের মাজারের স্বর্ণ–রৌপ্যের আসবাবপত্র লুঠ করে।[১৭] ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ আবদালী মারাঠাদেরকে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজতি করেন। হাজার হাজার মারাঠা আবদালীর সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হলে মারাঠারা দমে যায়, মুসলমানদের ওপর হতে মারাঠা বিপদ কিছুটা প্রশমিত হয় এবং মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী শক্তি ছিল শিখ। আহমদ শাহ আবদালীর একজন উত্তরাধিকারী জামান শাহ শিখদের কার্যাবলিতে সন্তুষ্ট হয়ে এক শিখপ্রধানের পুত্র রণজিৎ সিংহকে ১৭৯৯ সালে লাহোরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[১৮] উচ্চাভিলাষী রণজিৎ শীঘ্রই পাঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি হন। ১৮০১ সালে তিনি আফগান আধিপত্য অস্বীকার করেন এবং কাশ্মীর পর্যন্ত দখল করে উত্তর–পশ্চিমে একটি শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তারা ঐ এলাকার মুসলমানদের জীবনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে। কোনো যুক্তি বা কর্মসূচি ছাড়াই তারা যত্রতত্র লুটতরাজ করে বেড়ায়। তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল মুসলমানদের প্রতি সাধারণ বৈরীভাব।[১৯] শিখপ্রধান স্থানে মুসলমানেরা উচ্চস্বরে আজান দিতে পারত না। মসজিদগুলোকে তারা একটি একটি করে ধ্বংস করতে থাকে।[২০] মুসলমান জনপদ ধ্বংস করা এবং তাদের মান–সম্মান ধূলিসাৎ করাই ছিল শিখদের কাম্য। বস্তুত শিখদের সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্র ছিল না, তাদের ছিল লুটতরাজ ও খুনখারাবীর প্রতিষ্ঠান।[২১]

মুসলমানদের তৃতীয় বিরোধী শক্তি ছিল ইংরেজ। এরা প্রথমে বণিক হিসেবে এদেশে প্রবেশ করে এবং মুসলমান শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা হস্তগত করে। পূর্বদিক হতে এরা ক্রমশ পশ্চিমদিকে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

॥৩॥

মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে তারা তাদের পুরনো আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে হীনমন্যতার শিকার হয়। পীর ও ওলিদের কবর পূজা করা, মাজারে গিয়ে তাদের কাছে সন্তান কামনা করা ও বিপদাপদ দূর করার জন্য দোয়া করা

---

১৫. গোলাম হোসেন তাবতাবায়ী, সিয়ারে মুতাখখিরীন (বাংলা অনুবাদ : এম. আবদুল কাদের), পৃ. ৩১৮–২৩

১৬. Walter Wallbank, **A Short History of India and Pakistan**, p.60.

১৭. প্রায় সমসাময়িককালে মারাঠারা বাংলাদেশও লুণ্ঠন করে। — গোলাম হোসেন সলিম ; রিয়াজ উস সালাতীন (বাংলা অনুবাদ) পৃ. ২৭৪–২৮০

১৮. I.H. Qureshi, **A Short History of Pakistan**, vol. iv, pp. 105, 106.

১৯. Zafrul Islam, **"The End of the Sikh Rule" ; History of the Freedom Movement**, vol. II, Part I (Pakistan Historical Society) p. 72.

২০. তাবতাবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০,

২১. গোলাম রসুল মেহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

মুসলমানদের রীতিতে পরিণত হয়। বাংলার নবাব পরিবারে হিন্দু আচার–অনুষ্ঠান যেভাবে প্রবেশলাভ করেছিল তা থেকেও মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করা যায়।[২২] মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষ বা ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দেওয়ালির মতো উৎসবে যোগদান এবং মুসলমান ফকিরদের মাথার চাঁদি কামানো ও সর্বদেহ ভস্মাচ্ছাদিত করার রীতি প্রভৃতি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজজীবনে প্রবেশ করে।[২৩] মুসলমানদের শরিয়তসিদ্ধ বিধবা বিবাহ প্রথাও মুসলিম সমাজে গর্হিত, নিন্দনীয় ও কৌলীন্য পরিপন্থী গণ্য হতে থাকে।[২৪]

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী মুসলমান সমাজ ও ধর্মের এই অবনতি লক্ষ্য করেন এবং এক যুগধর্মী সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে ইনি দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রহীম সৈনিকের চাকুরি ছেড়ে শিক্ষকতা ও বিদ্যাচর্চা শুরু করেন এবং দিল্লির 'মেহেন্দিয়ুকা মহল্লা'তে এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[২৫] তিনি একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রসিদ্ধ ফতওয়া–ই–আলমগীরির সংকলনে অংশগ্রহণ করেন।[২৬] শাহ ওয়ালিউল্লাহ পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পরে হেজাজে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দিল্লিতে মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্য দিয়ে এ বংশের লোকদের শিক্ষকতা পেশা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি রাজনীতিতে কখনও মাথা না ঘামালেও রাজদরবারে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমাদর ছিল। মুঘলদের ক্রমাবনতি এবং মারাঠা ও শিখ শক্তির অভ্যুত্থান তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।[২৭] ফররুখ সিয়ারের অসহায় অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুবরণ, মারাঠা বিদ্রোহ এবং তাদের উত্থান, শিখ বিদ্রোহ, নাদির শাহের অভিযান, আহমদ শাহ আবদালীর বিজয়, উপমহাদেশের রাজনীতিতে রোহিলাদের অনুপ্রবেশ, ইরানি ও তুরানি আমীরদের পরস্পর হানাহানি, উপমহাদেশের প্রতি ইউরোপীয় জাতিগুলোর লোলুপ দৃষ্টি এবং আরও অনেক পরিবর্তন তিনি প্রত্যক্ষ করেন।[২৮] মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষাকল্পে তিনি ও তাঁর পিতা পতনোন্মুখ মুঘল শক্তিকে জোরদার করার জন্য নিজামুল মূলক, নাজিবুদ্দৌলা, পায়েন্দা খান রোহিলা, আহমদ শাহ আবদালী প্রমুখ মুসলমান নেতাদের কাছে আহ্বান জানান। মুঘল রাজশক্তির দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি উল্লেখ করেন যে অর্থনৈতিক অসাম্য, জায়গিরদারদের সংখ্যাধিক্যের দরুন খালসার অভাব ও তার ফলে সম্রাটের অর্থাভাব, কৃষক মজুর ও ব্যবসায়ীদের ওপর অত্যধিক করভার দেশকে ধ্বংসের

---

২২ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩ টীকা
২৩. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২৪. গোলাম রসুল মেহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
২৫. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
২৬. এস.এম. ইকরাম, **Modern Muslim India and the Birth of Pakistan**, P. 10.
২৭. হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
২৮. ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, **শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা** (বাংলা অনুবাদ : নূর–উদ–দীন আহমদ), পৃ. ১৪, ১৫